হরিদাকে যেমন দেখেছি

অরুণ কুমার রায়

প্রায়ছ'বছরের বেশি হল হরিদা মানে হরিসাধন দাশগুপ্ত চলে গেছেন বুকে একরাশ অভিমান আর না-পাওয়ার বেদনা নিয়ে। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় আমরা তাঁর জন্য কিছুই করে উঠতে পারলাম না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য! আসলে আমাদের সদিচ্ছা কোনদিনই ছিল না নইলে এত চলচ্চিত্র-উৎসব হলো, এত অনুষ্ঠান হলো অথচ হরিসাধন দাশগুপ্তের সমস্ত ছবিগুলি নিয়ে একত্রে দেখাবার কোন ব্যবস্থা হলো না! ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে উনি শুধুই নাম হয়ে রয়েছেন! হরিদার সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বছরের সম্পর্কের মধ্যে নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতায় অনেক ব্যাপারই ভিড় করে আসে মনে। কথা বলতে বলতে হরিদা অতিসহজেই ওঁনার অতীত, কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষ জনকে বা কিভাবে একেরপর এক তথ্যচিত্র তৈরী করে গেছেন, আমাদের চলচ্চিত্র জগৎ ফিল্মসোসাইটি আন্দোলন ইত্যাদি বহু বিষয়ই ছুঁয়ে যেতেন। আজ স্মৃতি চারণ করতে বসে স্বাভাবিক ভাবেই আমি একটু অস্বস্তিতে পড়েছি- কোন বিষয়কে ধরবো। আপাত ভাবে আমাদের চলচ্চিত্র জগতে একটা ধারণা প্রচলিত আছে 'হরিদা frustrated', মদ খেয়ে খেয়ে শেষ হয়েগেলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হরিদার সঙ্গে কুড়ি বছরের সম্পর্ক থেকে আমারযে অভিজ্ঞতা তা হলো এর উত্থেড্রা। হতাশা এসেছে আশাভঙ্গ থেকে। অনেক সময়েই অনেক ছোট ছোট চিত্রনাট্য লিখেছেন, পুর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র করার জন্যদু-দুটো স্ক্রিপ্ট শেষ পনের বছর ধরে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তুকেউই এগিয়ে আসেন নি। আসলে হরিদার ধারণা ছিল অনেকে এগিয়ে এসে তাঁকে ছবি করতে দেবেন। কিন্তু বর্তমানে যে তা হয় না এইটুকু বাস্তব বুদ্ধিতাঁর ছিল না। অথচ এই হরিদাকেই দেখেছি যখন কেউ কিছু লিখতে বলেছে বা সাক্ষাৎকার ছাপতে চেয়েছে এক কথায় রাজি হয়ে গেছেন। দেখেছি কতমানুষের টুক্‌রো আশ্বাসের উপর তিনি কল্পনার মায়াজাল বুনেছেন, আবার কয়েকদিন-এর মধ্যেই আশাভঙ্গের কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন। ১৯৯৪সালে বোম্বাই-তে শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ সম্বর্ধিত হওয়ার আগে বক্তৃতা তৈরীর সময়ে কতবার খসড়া নিয়ে কাটাকুটি করতে দেখেছি। হরিদার ওপর তথ্যচিত্র তৈরী করার সময়ে দেখেছি, কত সহজে অল্প কথায়তাঁর বক্তব্য পেশ করতে। আসলে তিনি একটু প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, একটু ভালবাসা চেয়েছিলেন, অনেক ধরনের স্বপ্ন দেখতেন ছবির জগতে বড় কিছু করার কিন্তু সেগুলো কোনটাই পূরণ না হওয়াতে হতাশা গ্রাসকরতে শুরু করেছিল। কিন্তু কাজের মধ্যে যখন থাকতেন তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।আমার এই কথাগুলো হরিদার আত্মজীবনী প্রকাশিত হলে বোঝা যাবে। কিভাবে তিনি বিগত ৫৫/৬০ বছরের আগের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিখে গেছেন,সন-তারিখ-সময় উল্লেখ করে ভাবতে অবাক লাগে! কিংবা ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রথম ছবি 'এ প্যারফেক্ট ডে' ছবির প্রতিটি শট কিভাবে নিয়ে ছিলেন তার minute details-এ বলে যাচ্ছেন আমার কাছে, শান্তিনিকেতনে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। লন্ঠনের আলোয় অবাক হয়ে শুনছি,গল্প বলার ভঙ্গিতে অতি সহজে ছবির ব্যাখ্যা করছেন। কিভাবে ওয়েলিংটনস্কোয়ারে শাঁটুল গুপ্তের সঙ্গে আর একজনের বক্সিং-এর শুটিং করলেন বাকিভাবে conceal ক্যামেরায় পূর্ণ সিনেমা হলের সামনে সস্ত্রীক চিদানন্দ দাশগুপ্তকে ধরলেন অথবা বংশীচন্দ্র গুপ্ত কিভাবে ছবির আর্ট ডিরেকশান দিলেন, অজয় কর কিভাবে চলন্ত বাস থেকে শট নিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সৌভাগ্য আমার, হরিদার কাছে এইভাবে প্রায় প্রতিটি ছবি তোলার ব্যাপারই জেনেছি, শুনেছি।

পরে হরিদার ওপর ছবি করার সময়ে, হরিদার ছবি গুলি দেখার সময়ে মিলিয়ে দেখেছি কি সাধ্য-সাধনা ও নিষ্ঠাভরে ছবিগুলি তুলেছিলেন। অবশ্য পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তর দশক পর্যন্ত তৈরী আশেপাশের মানুষজন, নানা ঘটনা,সব কিছুকেই জীবন্ত করে তুলতেন। গল্পবলার এই ক্ষমতা ছিল হরিদার অন্যতম গুণ। যতক্ষণ না ভুলে যাওয়া কোন নাম মনে আসছে ততক্ষণ ভাবতে থাকতেন। তবে দেখেছি সাধারণত খুব সকালে বা সন্ধেবেলা হরিদার মুড ও পুরোনো কথাকে মনে করে বলা খুব সহজ ছিল।

১৯৮৩ সালে নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষে হরিদা নন্দলালের ওপর আধ ঘন্টার তথ্যচিত্র করার ভার পেলেন। একদিন আমায় ডেকে বললেন, ''তুমি আমার চীফ এ্যাসিটেন্ট ডিরেক্টার হিসেবে কাজ করবে। রিসার্চ শুরু করে দাও, স্ক্রিপ্ট-এর একটা খসড়া বানাও।'' সেইমত কাজ শুরু করে দিলাম। বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতন-এ গেলাম। হরিদার সঙ্গে, রাজার সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা হত। রাজা ছিল ক্যামেরাম্যান। হরিদা চুপচাপ শুনে যেতেন আর মাঝে মাঝে এমন এক একটা প্রশ্ন করতেন তাতে বোঝা যেত তিনি কিভাবে ভিতরেভিতরে ছবিটা নিয়ে ভেবে চলেছেন। তিনটি পর্যায়ে শুটিং-এর ব্যবস্থা হলো। প্রথমে শান্তিনিকেতন, পরে মুঙ্গের এবং দিল্লীতে। শান্তিনিকেতনে বেশ কয়েকদিন ধরে শুটিং হয়েছিল। দেখতাম প্রত্যেকদিন রাত্রে হরিদা পরের দিনে কি কি শট নেওয়া হবে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং বলে দিতেন কিভাবে কোন্‌টার পরে কোন্‌ শটটা নিলে তাড়াতাড়ি হবে। এমনিতে সারা দিনে কাজ খুব ধীরে সুস্থে হতো। ছোটখাটো ব্যাপার ছবির মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন আনতে পারে লক্ষ্য করেছিলাম কালো বাড়ির সামনে শুটিং-এর সময়ে। রাজা ও আমি ফাঁকা বাড়িটার বাইরের দিক থেকে ধরবো ভাবছিলাম। হরিদা বললেন- দাঁড়াও,উনি ইশারায় দুর থেকে সাইকেলে চেপে যাওয়া সুন্দরী এক ছাত্রীকে ডাকলেন। বললেন- আমি ইশারা করলে সাইকেলে চেপে কোণাকুণি বেরিয়ে যাবে। পরেদেখেছি এই সামান্য বিষয় যোগ-এর ফলে ফ্রেমটি কত জীবন্ত হয়ে উঠলো। আবার মুঙ্গের-এ নন্দলালের পৈতৃক বাড়ির শুটিং-এর সময়ে দেখেছিফ্রেমের মধ্যে একটি ছাগল খানাকে এনে ছেড়ে দিলেন ফলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। হরিদার চোখ ছিল অসাধারণ। দিল্লীতে ললিত কলা অ্যাকাডেমীতে শুটিং চলাকালীন নন্দলালের আঁকা 'সুজাতা' বিরাট ছবি ছিল, ক্যামেরায় ধরার সময়ে আলো এমনভাবে সাজালেন যা আমাদের ভাবনায় ছিলনা। যেটা 'এ কিং ই এক্সাইল ছবির শুটিং-এর সময়ে দেখেছি বাজেটের মধ্যে কিভাবে ছবির খরচ রাখা যাবে সেই সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন। উনি বলতেন-'দেখ আমি যেসব ছবি করেছি, রাজার হালে, বড় বড় প্রোডিউসার পেয়েছি আর তোমার তো শুধুই লস্‌।''

হরিদার কথা বলতে গেলে মনে অনেক কিছুই ভিড়করে আসে। হরিদার ছবির মধ্যে আমরা হলিউডী কায়দা দেখতে পাই। তাঁরশট টেকিং, ফ্রেমিং এবং বিশেষ করে অ্যাঙ্গেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

বলতে গেলে তথ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে হরিদার প্রথম বড় ছবি - কোনারক। ১৯৪৯ সালে ড. পৃথ্বিশ নিয়োগী-র লেখার ওপর নির্ভর করে ডানলপ কোম্পানীর প্রযোজনায় এই ছবি তৈরী হয়। আধঘন্টার ছবির মধ্যে বোঝা যায় হরিদাব মুন্সীয়ানার ও পরিচালক হিসেবে বিশেষত্বকে। শুরু তেই কোনারকের মন্দিরের উপর থেকে আকাশ থেকে টপ শটে মন্দির ও আর আশ পাশকে প্রতিষ্ঠা করার পর দেখানো

হয় কিভাবে দলবেঁধে তীর্থযাত্রীরা মন্দির দেখতে আসছে। মন্দির দেখানোর ভঙ্গিটা অভিনব। সহজ ভাবে নীচে থেকে লো অ্যাঙ্গেল শট ব্যবহার না করে মইয়ের সাহায্যে একই পারস্পেকটিভ-এ প্রতিটি মূর্তিকে ধরে ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।মন্দিরের প্রত্যেকটি স্তরকে দেখানো হয় একেবারে সামনে থেকে। চলচ্ছিত্রীয় এই ভঙ্গির জন্য ছবিটি অন্য মাত্রা লাভ করেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য স্থানু রথের আপাত গতি লাভ। সম্পূর্ণ উত্থেড্রা দিক থেকে ট্রাকিংশট-এর সাহায্যে হরিদার থকে জীবন্ত করে তুলেছেন। উনি বলতেন, ''দেখ ট্রেনে করে যাওয়ার সময় আমরা দেখি সামনের গাছগুলো দ্রুত এগিয়ে এসে দৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে যায়, আমায় এই ব্যাপারটা strike করেছিল, ভাবলাম আমরা যদি রথটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনে হবে রথটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেইমত বুলুর সঙ্গে আলোচনা করে শট নিয়েছিলাম।'' এই তথ্যচিত্রের সংগীতও সম্পদ। বিশেষ করে বৃত্তাকার ট্রাকিং শট-এ দুটো হাতিকে ধরার দৃশ্যে এবং মন্দিরগাত্রে খোদাই করা নৃত্যমূর্তি গুলোকে দ্রুত কাটের মাধ্যমে ধরার সময় সংগীতের ব্যবহার অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের। সমস্ত মন্দিরটি বর্ণনা করার পর-আবার প্রথম দৃশ্যের মতো তীর্থ যাত্রীদের দেখানো হয়। মূল ছবিটার প্রযোজক ছিল ডানলপ ফলে ছবির শেষে মাত্র একটা লাইন ধারাভাষ্য ছিল; ''কলকাতা থেকে কোনারক সূর্যমন্দির যেতে ডানলপ টায়ার-এ .ঘন্টা লাগে।'' পরের দিকে ফিল্মস ডিভিশন-এর জন্য ছবিটাতে হরিদা অল্পকিছু শট পাথেড্র ছিলেন এবং অবশ্যই ধারাবাহিকের শেষ অংশটা।

১৯৫৪ সালে 'পাঁচথুপী' ছবির আগেহরিদা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছবি করেছিলেন বার্মাশেল কোম্পানীর প্রযোজনায়-'উইভার্স অফ মান্দারগি'।

বর্তমানে ছবি দুটির অস্তিত্ব হয়তো একমাত্র বিদেশে আছে। সলিল চৌধুরীর সংগীত, ঋষিকেশ মুখার্জ্জীর সম্পাদনা ওকে বৈকুন্ঠের ক্যামেরা। গ্রামে গিয়ে পড়ে থেকে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার জীবনযাত্রাকে লক্ষ্য করে ছবি করার প্রবনতা বরাবরই হরিদার ছিল। এবং এটা তাঁর ছবি করার বিশেষত্ব ছিল। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেথেকেছেন কখন আকাশ পরিষ্কার হবে, মনোমত শট নিতে পারবেন। আবার কখনও আকাশের পরিবর্তন দেখে চঞ্চল হয়ে উঠে তখুনি ক্যামেরা রেডি করে ছবিতুলেছেন। এই দুটি ছবি থেকেই হরিদার তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে এক আলাদা চেহারার পরিচয় মিলতে শুরু করে। বিশেষ করে ক্যামেরার যে কোণ (angle) তিনি বেছে নিতেন তাতে শুধুমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তুই নয়, চারিদিকের পরিবেশ জীবন্ত হয়েউঠতো। প্রতিটি ফ্রেমের মধ্যেই থাকতো বিস্তীর্ণ আকাশের পশ্চাদপটে দৃশ্য। লো-অ্যাঙ্গেল শটই বেশি পছন্দ ছিল। ফলে হলিউডী ছবির ধরনের আকাশে মেঘের খেলাও ধরা পড়তো। এই ব্যাপারটা হরিদার 'মালাবারস্টোরি', টাটা স্টিলের ছবি, উইভার্স অফ মান্দারগী, পাঁচথুপী সব ছবিতেই আছে।

বার্মাশেলের হয়ে যে ছবি করেছিলেন, তার প্রথমটি হলো, ''পাঁচথুপি -'এ ভিলেজইন ওয়েষ্টবেঙ্গল''। ছবিটির প্রযোজক ছিলেন জেমস বিভারিজ। মুর্শিদাবাদের 'পাঁচথুপী' গ্রামে গিয়ে দীর্ঘদিন পড়েথেকে এছবি তোলেন হরিদা। ছবিটির মধ্যে অনেক অভিনবত্ব আছে। পাঁচথুপী গ্রামের মেয়ে গৌরী তার বাপের বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এসেছে দূর্গা পূজা। অদ্ভুদ ক্রমশ-কাটিং-এর মাধ্যমে

একবার দেবী দূর্গার মুখ,একবার গৌরীর মুখ ধরার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দূর্গাপূজায় বাংলার মেয়ের বাপের বাড়ি ফেরার সহজ অনুষঙ্গ এসেছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজেছে সলিল চৌধুরীর সংগৃহীত বাংলার লোকগীতি। মনে রাখতে হবে যখন এই ছবি তৈরী হচ্ছে তখনও 'পথেরপাঁচালী' মুক্তি পায়নি। এতে এমন অনেক শট আছে যা পথের পাঁচালীতেওআছে। যেমন পথের পাঁচালীতে মিষ্টি ওলার পিছন পিছন অপু-দূর্গার হেঁটে যাওয়াকে পুকুরের প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে ধরা হয় এখানেও তেমনি গ্রামেতে ব্যান্ড-বাদকের দল যখন পুকুর পাড় দিয়ে যায় তখন তাদেরকে পর্দায় না দেখিয়ে পরিচালক পুকুরে তাদের চলমান প্রতিফলনের মধ্যেধরেন। এই ধরনের একাধিক শট আছে যার থেকে বোঝা যায় হরিসাধন বাবু হঠাৎ ছবি করতে আসেন নি। আমাকে সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য করেছে এবং অন্য একটি ভাবনার জন্ম দিয়েছে তা হল ঋত্বিক ঘটক তখন পর্যন্ত 'নাগরিক' করেছেন, 'মধুমতী' ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। কিন্তু তাঁর ভাবনায় পরবর্তী কালে দেব-দেবীর সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে ছবিরমূল চরিত্র গুলির অর্থদানের ব্যাপারটা যা ঋত্বিকের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বলেজানি তখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। অথচ হরিসাধনের পাঁচথুপী ছবিরমধ্যে এই বিষয়টি ভালমতন ভ্রুণ আকারে পাওয়া যায়। বাংলার মেয়ে গৌরী,আর দূর্গা যেন এক। নামেও মিল এবং বাপের বাড়ি আসা এবং যাওয়া সময় কাল সবেতেই মিল। আর এই ব্যাপারটাই আরো জোরদার হয়েছে বিবাহ এবং বিসর্জন সংক্রান্ত নানা লোকগীতির ব্যবহারে। অথচ আমরা কেউই হরিসাধনকে স্বীকৃতি দিই নি। বর্তমানে ছবিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখলে আমার এই কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। চলচ্চিত্র মাধ্যমে কোন কিছুবলার এই অসুবিধেটুকু আছে। মুক্তি পাওয়ার সময়ে সমালোচকের চোখ এড়িয়েগেলে পরবর্তী কালে কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে যাওবা নতুন করে আবিষ্কার করাসম্ভব, তথ্যচিত্রের বেলায় সেই সুবিধাও নেই। এই ছবির ক্ষেত্রে হরিদার দুভার্গ্যের শেষ ছিল না। কারণ প্রযোজক জেমস বিভারীজ বিদেশে ছবিটি নিয়ে গিয়ে প্রথমে মিনিট তিনেক - এর মতো একটা ন্যারেশান যোগ করে ছবিটির নাম বদল করে দিয়েছেন-''Goddess Comes Home''। পুণার আর্কাইভে প্রাক্তন ডিরেক্টর পি.কে. নায়ার-এর আগ্রহে সেই ছবির একটি প্রিন্ট আছে।

আমি পুণাতে গিয়ে বার তিনেক ছবিটি দেখে হরিদাকে ব্যাপারটা বলেছিলাম। হরিদা বললেন, 'আমার অনেক ছবিরক্ষেত্রেই এটা হয়েছে। যেহেতু ছবির প্রযোজক ছিল শেল কোম্পানী, পরে বিভারীজ সাহেব ওই ছবিকে নিজের বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। নায়ার ব্যাপারটা জেনে ছবিটার একটা প্রিন্ট কেনার ব্যবস্থা করেন। তুমিত দেখেছ, ছবির কমেন্ট্রি চ্যানেল, মিউজিক চ্যানেল, শুটিং-এর স্থির চিত্র সবই আমার কাছে আছে।'

আপাতভাবে আমরা হরিদাকে অগোছালো বলে জানি।কিন্তু হরিদা প্রাইভেট প্রযোজকদের ছবি ডেলিভারি দেবার সময়ে নিজের জন্য একটা করে প্রিন্ট রাখতেন। পরবর্তীকালে যত্নের অভাবে সেই প্রিন্টগুলি তেমনভাবে রক্ষিত হয়নি। প্রথমেনিউ-থিয়েটারর্স স্টুডিও-তে হরিদার একটা আলমারির মধ্যে প্রিন্টগুলি ছিল। হাতের কাছেই রবিশংকর, আলি আকবর, তিমিরবরণ, ভি.বালসারার সংগীত বা এফেক্ট মিউজিক তৈরি করেছেন। তাঁদের তরফে প্রিন্টগুলো রক্ষা করার কোনরকম চেষ্টাই হয়নি। হরিদার বিখ্যাত সব ছবিগুলির প্রিন্টই ওখানে রাখা ছিল। পরের দিকে আশির দশকের শেষের দিকে যে কটা ছবি বেঁচে ছিল সেগুলি, তার সঙ্গে সাউন্ড ট্র্যাক, সঞ্জয় সেনের কিছু ছবি উত্যাদি নিয়ে

হরিদার ছেলে রাজা গলফ্ ক্লাব রোডের ফিল্ম সার্ভিসেস-এ একটি আলমারিতে রেখে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে আলমারি খোলা হয়নি এবং লোহার স্পুল-এ ফিল্ম গুলি গোটানো ছিল। এরপর আমি যখন হরিদার ওপর ছবি তৈরি করতে গেলাম তখন চাবি না পেয়ে আমি আর রাজা বাধ্য হয়ে আলমারিটির তালা ভাঙ্গি। ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্য থেকে ১৬ মি.মি. তোলা 'উইভার্স অফ মান্দারগি', ইউ. এস. আই. এস. এ একটা দু-রীলের ছবি, কোনারক ছবির সাউন্ডট্র্যাক এবং অন্যান্য কয়েকটা ছবির সাউন্ডট্র্যাক, সঞ্জয় সেনের তোলা স্টিলের ওপর একটা ছবির কিছু অংশ ইত্যাদি পাওয়া গেল। কিন্তু ১৬ মি.মি. ছবির স্পুলটা হাতে নিতেই আমাদের চোখের সামনে 'উইভার্স অফ মান্দারগি' ছরিটি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েঝরে পড়ল। সমস্ত ফিল্মটির ইমালশাল উঠে গিয়ে এমন চেহারা নিয়েছিল যে বলার কথা নয়। সাউন্ড ট্র্যাকগুলি পরিষ্কার করে আমি স্পুলেতুলে রেখেছি। পরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে হরিদাকে এই খবর দেওয়াতে উনি বলেছিলেন-' আমার ছবিগুলি থাকলে লোকে হয়ত আমায় ভুলত না, কিন্তু এখন ভুলে যাওয়া সহজ হবে। তাছাড়া, আমি ভাবছি তুমি কিভাবে আর আমার ওপর ছবি করবে? কিছুদিন পরে দেখবে কোন ছবি আর পাওয়া যাবেনা'। অবশ্য হরিদার একথা সত্য হয়নি। ১৯৯৪ সালে ইমেজ ইন্ডিয়ার দিলীপদা কথা প্রসঙ্গে বলেন ওনার কাছে ঋষিকেশ মুখার্জির এডিট করা দুটো একরীলের ছবি আছে। আমি আর উনি ছবিটা মুভিওয়ালাতে চালিয়ে দেখি ১৯৫৩ সালেহরিদার তোলা দুটো বিজ্ঞাপন চিত্র 'শহর কি ঝলক' ও'গাও কি কহানী'। গাঁও কি কহানীতে অভিনয় করেছেন কেষ্ট মুখার্জি ও অন্য ছবিটিতে মেহমুদ। আমার পরিষ্কার করা সাউন্ড্ট্র্যাকের মধ্যে 'মালাবার স্টোরি', কোয়েস্ট ফর হেলথ','কোনারক' ইত্যাদি আছে। হরিদার কাছ থেকে প্রশ্ন করেকরে প্রায় প্রতিটি ছবি সম্বন্ধেই জেনেছি। কিভাবে শুটিং হয়েছিল,কি কি অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সুবিধা এই ছিল, হরিদা গল্পকরতে ভালবাসতেন, ফলে প্রায় সব ছবি সম্বন্ধেই কৌতুহল মিটিয়েছিলাম। হরিদার প্রধান প্রধান তথ্যচিত্র গুলি আমার দেখা থাকায় আলোচনায় সুবিধা হত। একবার হরিদাকে বললাম তঁ ার মতে তাঁর তৈরি শ্রেষ্ঠ ছবি গুলি কি কি। হরিদা কয়েকদিন বাদে একটা কাগজ দিলেন দেখি তাতে গোটা বারো ছবির নাম। আমি বললাম প্রায় শ'খানেক ছবি করেছেন অথচ তার মধ্যে মাত্র বারোটা ছবিকে বেছেছেন। হরিদা বললেন- 'দ্যাখো, এর মধ্যে অনেক ছবিই অর্ডারী, নানারকম খুঁত আছে। কিন্তু এই বারোটা ছবি করে আমিখুব স্যাটিসফায়েড'। মজার ব্যাপার, ছবির তালিকায় চার দশকেরই ছবি আছে। ছবিগুলি হল - কোনারক, পাঁচথুপী, উইভার্স অফ মান্দারগি, ট্রায়াল অব স্ট্রেংথ, স্টোরি অফ্ টাটা স্টীল, মালাবার স্টোরী, বাবা, বড়ে গোলাম আলি, কোয়েষ্ট ফর হেলথ্, টি বোর্ডের ছবি, ইউনিয়ান কার্বাইডের ছবি, পোর্ট ট্রাষ্টের ছবি।

বর্তমানে আমরা স্পন্সরদের প্রযোজিত নানাছবি দেখি। কিন্তু চল্লিশ দশকের শেষে বা পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় স্পনসরদের রাজী করিয়ে ছবির ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার পিছনে হরিদার অবদান অনেক খানি। বিজ্ঞাপনের প্রথারীতি মেনে চলেননি তাতে লাভ হয়েছে আমাদের। তিনি প্রতিটি ছবিকেই শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন চিত্র হিসেবে না দেখে বিষয় বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের ব্যবহারে নতুন নতুন চেহারা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং এই কাজে তাঁর সহায়ক হয়েছেন সম্পাদক হৃষিকেশ মুখার্জি, সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী প্রমুখ। ছবিগুলি তৈরির ব্যাপারে হরিদার স্বাধীনতা ছিল। তিনি কর্তা ব্যক্তিদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে অহেতুক নাক-গলানো ছবির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে বিষয়টুকু পরবর্তীকালে স্পনসর ছবির ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি করেছে।

গোড়ারদিক থেকেই হরিদা নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেন। হলিউডের শিক্ষাতাঁর কাজে লেগেছিল। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিটি বিভাগকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন- ভালো স্ক্রিপ্ট ছাড়া ভালো ছবি হয় না। বিজ্ঞাপন চিত্রই হোক বা তথ্যচিত্র হোক বা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি হোক কখনই সাজিয়ে গুছিয়ে স্টুডিও-ওর মধ্যে কাজ করা তিনি পছন্দ করতেন না। বাইরের জীবনের মধ্য থেকে শুটিং করে সম্পাদনার টেরিলে বসে ছবি তৈরি করতেন।কোনরকম বাঁধাধরা চিত্রনাট্য কখনও অনুসরণ করতেন না, শুটিং স্পটে গিয়েসিদ্ধান্ত নিতেন। এই সমস্ত কাজের জন্য তিনি পঞ্চাশ দশক থেকে একটিবড় ভ্যান গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে ক্যামেরা, আলোর সরঞ্জাম, রেকডিং- এর ব্যবস্থা, এমনকি বিশ্রাম নেবার মত ছোট বিছানার ব্যবস্থাও ছিল। পুরো দল নিয়ে শুটিং-এর গাড়ি নিয়ে তিনি সরাসরি লোকেশানে গিয়ে শুটিং করতেন। তখন কলকাতায় এমনকি বোম্বাইতে এই ধরনের ব্যবস্থার কথা কেউ ভাবেন নি। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যাঁরা সত্যিকালের ভালবাসা নিয়ে যুক্ত হতে চায় তাঁদের তিনি কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সুনীল দত্ত একসময় তাঁর কাছেসেত্রে টারী হিসেবে ৫০০ টাকা মাহিনায় কাজ করেছেন। বোম্বাইতে থাকার সুবাদে দিলীপ কুমার, অশোক কুমার, মেহমুদ, লতা মঙ্গেশকার প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অনেককে তাঁর বিজ্ঞাপনের ছবিতেও ব্যবহার করেছেন। ডানলপ কোম্পানী প্রযোজিত দুটি বিজ্ঞাপন চিত্রের প্রথমটি 'ট্রায়াল অফ স্টেংথ'-এ অভিনয় করেছিলেন দারা সিং ও রণধাওয়া দ্বিতীয়টিতে অশোক কুমার ও মীনাকুমারী। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ এই দুবছরের মধ্যে হরিদা বিভিন্ন কোম্পানীর হয়ে বিজ্ঞাপন চিত্র তোলেন। লিপটন, আই-টি-সি, আই -সি-আই, ডানলপ প্রভৃতির জন্য। এছাড়া লিপটন ছোট ছোট বেশকয়েকটি ছবির প্রযোজনা করে। ইম্পেরিয়াল টোবাকো দুটি ছোট্ট ছবি ও ডানলপ খেলার ওপর একটি ছবি প্রযোজনা করে। ছবিগুলির সম্পাদনা করেছিলেন ঋষিকেশ মুখার্জি ও সংগীত পরিচালক ছিলেন সলিল চৌধুরী।

জীবনধারণের প্রয়োজনে তাঁকে নিয়মিত ছবিকরে যেতে হত। ফোর্ড ফাউন্ডেশান এবং ইউ. এস. আই. এস-এর প্রযোজনায় কৃষিবিষয়ক অনেকগুলি ছবি করেন। ছবিগুলি এক রীল বাদু-রীলের। ছবিগুলি গুণগত মানের দিক দিয়ে হরিদার অন্যান্য ছবির সমগোত্রীয় নয় কিন্তু তারই মধ্যে বিক্ষি প্তভাবে হরিদার তনিজ স্বতাকে খুঁজেপাওয়া যায় বিশেষ করে ফ্রেমিং ও ক্যামেরার কোণ নির্বাচনের মধ্যে।

হরিদার অন্যতম প্রিয় ছবি দুটি হলো 'টাটা স্টিলের' ছবি ও 'মালাবার স্টোরী'।'মালাবার স্টোরী' প্রসঙ্গে বলতেন রঙনিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে। ছবির প্রথম দিকে মালাবার উপকূলে সূর্যোদয়ের সময়ে রঙীন ছবিটি নে অয়েল পেন্টিং-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

হরিদার ছবির বিষয় বৈচিত্র্য ব্যাপক। পাহাড়, সমুদ্র, নদী, বনের পাশাপাশি মন্দির, কল-কারখানা, ঔষধ তৈরি, জাল বোনা, চাষবাস সবই আছে। যখনই মানুষকে ধরেছেন তখন যেন ছবির মেজাজ বদলে যায়। অবশ্য শুধুমাত্র ওষুধের ক্যাপসুল সত্যজিৎ রায়ের সংগীতে যে নৃত্য দেখায় তা আমাদের আশর্চ্য করে দেয়।

ছবি করতেন ধীরে সুস্থে। শুটিং করতেন বেশিকরে। একই দৃশ্য বিভিন্ন কোণ থেকে নিতেন। ছবি করবার সময়েই ছবির একটাচেহারা রূপ নিত সেটাই সম্পাদকের টেবিলে সংগীতের সুবিধা নিয়ে

সামগ্রিক ভাবে ধরা দিয়েছে। সম্পাদনার ব্যাপারে তিনি নির্মম ছিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুন্দর দৃশ্য হরিদার প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই ছড়িয়ে আছে কিন্তু ছবিতে তাদের স্থায়ীত্ব খুব অল্পক্ষণের।

প্রায় সবকটি ধরনের তথ্যচিত্র ছবি তিনি করেছেন, ব্যাক্তিত্বদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বড়ে গোলাম আলি, বাবা আলাউদ্দিন, যতীন দাস এবং রামকিংকর (রঙীন অসমাপ্ত)। দেখা গেছে তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বাধীন হলে স্বছন্দে কাজ করেছেন। চলচ্চিত্র তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্মে বা কথায় ঘুরে ফিরে আসত। কোনো জায়গায় বেশিদিন একভাবে বাস করা তাঁর স্বভাববি দ্ধ ছিল। হরিপদ দত্ত লেন থেকে বিজাপুর, রাজপুর থেকে যোধপুরপার্ক, আবার রাজপুর আবার সেখান থেকেগেলেন শান্তিনিকেতনে। বলতেন'বরাবর ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করবো, তখন ছবি আঁকতাম। কিন্তু বাবার ইচ্ছায় কস্ট এ্যাকাউন্টেনসী পড়তে গিয়ে ছবির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। ইচ্ছা ছিল বড় ছবি করবো। কিন্তু বাধ্য হলাম ছোট ছবি করতে। জীবন দলুয়ের বাড়ি থেকে রতন পল্লীতে মিত্রদের বাড়ি, সেখান থেকে পৌষালী-র উত্থেড্রা দিকের ঘরে এই ভাবে শান্তিনিকেতনেই বার পাঁচেক ঘর পাথেড্রছেন। শেষে গিয়ে উঠেছিলেন মৌলডাঙ্গায় মুসলিম পরিবারে। সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন পেয়িং গেষ্ট। বলতেন 'আমার জীবনে দেখাটা কম নয়, সমাজের গণ্যমান্য লোকেদের দেখেছি আবার সাধারণলোকের দাওয়ায় বসে হ্যারিকেনের আলোর মুড়ি খেতে খেতে গল্প করেছি। আমার কোন অসুবিধা হয় না। দেখেছি মানুষের বিচিত্র রূপ'।

হরিদা সহজেই সকলের আপন হয়ে উঠতেপারতেন। ছোট-বড় সকলের কাছেই তিনি ছিলেন দাদু। ছোট ছেলে-মেয়েদেরলেখা-পড়া শেখাতেন সেখানে সিনেমার কোন জগৎ ছিল না। আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম আর অবাক হয়ে দেখতাম কিভাবে উনি গ্রামের মানুষদের কাছেপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। পঞ্চাশ বছর ধরে ছবির জগতে থেকে তিনিশেষ জীবনে শুধুমাত্র লেখার পাতায় সেই জগৎকে ধরার চেষ্টা করে গেছেন। মাঝেমাঝেই ছবি করার ভাবনা তাকে যন্ত্রণা বিদ্ধ করেছে। যখন বললাম আপনার ওপর ছবি করতে চাই তখন বললেন কি হবে? পরে যখন শুটিং করতে গেলাম। উনি খুশি হলেন, বললেন তাহলে সত্যি সত্যিই ছবি হচ্ছে। ফিল্মের এখন কিরকম দাম? টেকনিশীয়ানরা কত টাকা পায়? এইসব প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কতজন এসেছি, কোথায় থাকছি, খাবারের কি ব্যবস্থা হবে সমস্ত জানলেন এবং বললেন দেখ সরস্বতীকে (জীবনের স্ত্রী) বলে প্লেট সিস্টেম করে নাও বেচারীরা দুটো পয়সা পাবে আর তোমাদেরও খাওয়া- দাওয়াতে বেশি সময় নষ্ট হবে না। সেইমত ব্যবস্থা হলো। তিনিদু-বেলা সবার দিকেই নজর রাখতেন। আমাদের কখনই মনে হয় নি আমরা ছবি করতে গেছি। প্রতিটি শর্টের আগে ওনরা সঙ্গে আলোচনা করে নিতাম। মাঝেমাঝে কিছু সাজেশান দিতেন। আমার একটাই সান্ত্বনা ছবির রাফ কাটের পরেকমেন্ট্রি ট্র্যাক লাগিয়ে হরিদাকে দেখাতে পেরেছি। ওনার ভাল লেগেছিল।

মউলডাঙার থেকে বার দুয়েক কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় আসলে আমার কাছে আসবেনই। বললেন-'দেখ এখানে গরীবমুসলিম ফ্যামিলীতে দেখছি কি যত্ন।' নাসিরের স্ত্রী ওনাকে 'বাবা'বলে ডাকতেন। হরিদা মারা যাবার পরে তাঁর কান্না দেখে মনে হয়েছিল হরিদা সত্যই তাদের আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। শান্তিনিকেতনের পথে পথে এখনও বাউল গান গেয়ে বেড়ায়। হরিদাকে দেখে আমার

মনে হতো ‘কোথায় আমার মনের মানুষরে/ তার লাগি পথের ধারে আমি বান্ধিঘর’। তিনি সেই মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেরিয়েছেন ক্ষ্যাপা বাউলের মতো। বাস্তবে আর কল্পনার দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ মানুষ হরিসাধন তাই থিতু হতে পারেননি। নতুন নতুন পরিবেশে নতুন নতুন মানুষের কাছে গিয়েছেন, তাদেরকে আপনকরে নিয়েছেন। যাদের সঙ্গে থাকতেন তারা কেউই তাঁর অতীত জানতো না, তিনিও কখনও জানবার চেষ্টা করতেন না। এই দ্বৈত ব্যাপারটা তাঁর ছিল। তাঁর সঙ্গে থেকে জীবনের অভিজ্ঞতার শরিক হওয়ার মধ্যদিয়ে বুঝেছি চলচ্চিত্র জীবনেরই অঙ্গ।

অরুণ কুমার রায়-এর জন্ম কলকাতায়১৯৫৩-তে। ফিল্ম ইনস্টিটিউট এবং টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সত্তর দশক থেকেই ফিল্ম সোসাইটির সক্রিয় সদস্য। ১৯৮০-তে শীতল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত বই - সত্যজিৎ রায় - ভিন্ন চোখে। ১৯৮২-তে যুগ্ম সম্পাদনায় দ্বিতীয় বই - 12 Indian Directors। ১৯৮৬-তে তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র গ্রন্থটি চলচ্চিত্র বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। সম্প্রতিক কালে (২০০৩) হরিসাধন দাশগুপ্তকে নিয়ে লেখা তাঁর বই । ১৯৯৫-তে তাঁর তৈরী ৩২ মিনিটের তথ্যচিত্র জাতীয় পুরস্কার পায়। ১৯৯৫-তেইতৈরী করেন ১৬ মিনিটের তথ্যচিত্র রেনোয়া ইন ক্যালকাটা। ১৯৯৭-তে তৈরী করেন City of Subhaschandra (২৭ মিনিটের তথ্যচিত্র)। এ ছাড়াও হরিসাধন দাশগুপ্তকে নিয়ে ৩৬ মিনিটের অন্য একটি তথ্যচিত্র A King in Exile প্রায় সম্পূর্ণ হবার মুখে। এছাড়াও দূরদর্শনের জন্য তিনি কিছু তথ্যচিত্র করেন। তাঁর তৈরী তথ্যচিত্রগুলি দেশে-বিদেশে অনেক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। দু’দুবার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অরুণ রায় এ যাবৎ ষাটটিরও বেশী প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায়। বর্ণমালা, জয়ন, চিত্রলেখা, কলকাতা পুরশ্রী (কলিকাতা পৌরসভা কতৃক প্রকাশিত) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও যুক্ত।

অরুণ রায়ের সৌভাগ্য হয়েছিল আপাত বিস্মৃত অথচ এক অসামান্য প্রতিভা হরিসাধন দাশগুপ্তকে খুব কাছ থেকে নিবিড় ভাবে দেখার - তাঁর সঙ্গে কাজ করার। এই লেখাটি সেই অমূল্য অভিজ্ঞতারই সহজ প্রতিফলন। কেবল ব্যক্তি জীবন নয়, হরিসাধন দাশগুপ্তর কর্মজীবনের এক সংক্ষিপ্ত দলিল এই লেখাটি। এই লেখাটি অরুণ কুমার রায় সম্পাদিত বই‘চলচ্চিত্র, মানুষ এবং হরিসাধন দাশগুপ্ত’ থেকে সংগৃহীত।